স্বাস্থ্য সংলাপ

icddr,b

বিষাক্ত পটকা মাছ খাওয়া থেকে বিরত থাকুন!

নুসরাত হোমায়রা, আইসিডিডিআর,বি

পটকা মাছ খেয়ে মৃত্যুর খবর আমরা প্রায়ই শুনি। তবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক মানুষের কাছে হয়তো এখনো এ-খবর পৌঁছে নি। তাদের কাছে এ-খবর পৌঁছানোর লক্ষ্যেই স্বাস্থ্য সংলাপে এই প্রতিবেদনটি ছাপা হলো।

পটকা মাছ ইংরেজিতে 'ব্লো' বা বেলুন মাছ হিসেবে পরিচিত এবং স্থানীয়ভাবে একে পটকা বা টেপা মাছ বলা হয়। পটকা মাছে 'টেট্রোডোটক্সিন' (টিটিএক্স) নামে একটি বিষাক্ত পদার্থ থাকে, যা খুব তাড়াতাড়ি মানুষের মৃত্যু ঘটাতে সক্ষম। পটকা মাছের এই বিষাক্ত পদার্থটি তার যকৃত, ডিম্বাশয়, অন্ত্র এবং চামড়ার মধ্যে খুব বেশি ঘনীভূত থাকে। মাছের বিষের পরিমাণ নির্ভর করে এর লিঙ্গ, ভৌগলিক অবস্থান এবং মওসুমের ওপর। প্রজননের ঠিক আগে এবং প্রজননকালীন সময়ে এতে অপেক্ষাকৃত বেশি বিষ থাকে এবং পুরুষের থেকে স্ত্রীজাতীয় মাছ বেশি বিষাক্ত, কারণ অণ্ডকোষের চেয়ে ডিম্বাশয় বেশি বিষাক্ত থাকে। এশিয়া মহাদেশের সমুদ্র-উপকূলবর্তী এলাকাসমূহের মানুষ যেসব বিষক্রিয়ার সাথে সবচেয়ে বেশি পরিচিত সেগুলোর মধ্যে পটকা মাছের বিষক্রিয়া একটি। এ-বিষের ফলে মানুষের জিহ্বা এবং ঠোঁটের স্বাদ নেওয়ার ক্ষমতা থাকে না, মাথা ঘোরে ও বমি হয় এবং পরবর্তীতে শরীর অসাড় হয়ে আসে, সারা শরীর ঝিনঝিন করে, হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, রক্তচাপ কমে যায়, মাংসপেশী অসাড় হয়ে পড়ে এবং শ্বাসতন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তবে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ২৪ ঘণ্টার বেশি যে জীবিত থাকে সে সাধারণত বেঁচে যায়।

পটকা মাছ

ভেতরের পাতায়

- গর্ভধারণ ও সন্তানপ্রসব-সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বার্তা
- বহুল-ব্যবহৃত কিছু রোগনির্ণয় পদ্ধতি সম্পর্কে জানুন
- গর্ভাবস্থায় আরএইচ অসামঞ্জস্যতার ফলে সৃষ্ট সমস্যা ও প্রতিকার
- জন্মপূর্ব রোগনির্ণয় বা প্রিন্যাটাল ডায়াগনোসিস

বর্ষ ২১ | সংখ্যা ২

অগ্রহায়ণ ১৪১৯ | নভেম্বর ২০১২

ISSN 1021-2078

icddr,b

আইসিডিডিআর,বি উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, ক্রনিক ও অসংক্রামক রোগ, এইচআইভি/এইডস, স্বাস্থ্যের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক কর্মকাঠামো, জেন্ডার স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক	আব্বাস ভূঁইয়া
উপ-প্রধান সম্পাদক	প্রদীপ কুমার বর্ধন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
সম্পাদক	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

সদস্য

রুখসানা গাজী, মোঃ ইকবাল, মাসুমা আক্তার খানম, রুবহানা রকিব ও মাখদুম আহমেদ

সহযোগিতায়	হামিদা আক্তার
পৃষ্ঠাবিন্যাস	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা সম্পাদক বরাবর ডাকযোগে বা ইমেইল-এর মাধ্যমে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

প্রকাশক

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৯৮৪০৫২৩-৩২
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮১৯১৩৩, ৮৮২৩১১৬
ইমেইল: hasib@icddrb.org

কোনো লেখায় ব্যক্ত মতামতের জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

মুদ্রণ: দেলোয়ার প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং, ঢাকা

২০০৮ সালের এপ্রিল-জুন মাসের মধ্যে নংরসিংদী, ঢাকা এবং নাটোর জেলায় পটকা মাছের বিষক্রিয়াজনিত তিনটি প্রাদুর্ভাব সংঘটিত হয়। এসব প্রাদুর্ভাবে ৮৪ জন মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং এদের ১২ জন মারা যায়।

২০০৮ সালের ৯ এপ্রিল নরসিংদীতে ৪০ ব্যক্তি পটকা মাছ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তাদের ৫ জন মারা যায়। প্রাদুর্ভাবকবলিত গ্রামবাসীরা জানায় যে, প্রাদুর্ভাবের দিন এই মাছ পার্শ্ববর্তী কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর উপজেলা থেকে এসেছিলো, এবং কুলিয়ারচরে এই মাছ কক্সবাজার থেকে এসেছিলো বলে জানা যায়। ৩ জুন ২০০৮ তারিখে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে জানা যায় যে, ঢাকা শহরের তেজকুনি পাড়ার কিছু মানুষ পটকা মাছের বিষে আক্রান্ত হয়। এগার জন এই মাছ খায়, তাদের ৯ জন বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং ৩ জন মারা যায়। ২০০৮ সালের জুন মাসে নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার দমদমা গ্রামের ৩৫ জন পটকা মাছ খেয়ে অসুস্থ হয়। এদের ৪ জন পরে মারা যায় (চিত্র)। গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে পটকা মাছের বিষক্রিয়া এবং বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক

চিত্র: মাছ খাওয়ার পর থেকে যতক্ষণের মধ্যে রোগীরা অসুস্থ হয়ে পড়ে

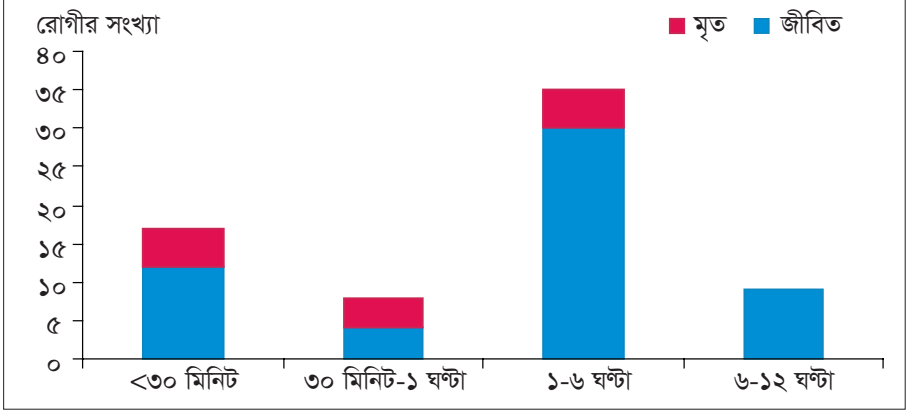

পটকা মাছ সম্পর্কে অজ্ঞতাই প্রাদুর্ভাবসমূহের জন্য দায়ী। তিনটি প্রাদুর্ভাবের সব রোগীই মাছ খাওয়ার পর খুব শীঘ্রই শরীরের সর্বত্র একটি ঝিনঝিনভাব, চুলকানি, জিহ্বা ভারী ও অসাড় হয়ে-যাওয়া, মাথা-ঘোরা, মাথাব্যথা, হাঁটতে অসমর্থতা এবং সাধারণ দুর্বলতাসম্বলিত রোগের লক্ষণের কথা জানিয়েছে।

যদিও পটকা মাছের বিষক্রিয়াজনিত ঘটনা ইতোপূর্বে বাংলাদেশের কোনো কোনো স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে ঘটেছে, একই বছরে তিনবার সংঘটিত প্রাদুর্ভাব থেকে বোঝা যায় যে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যসমস্যা। পটকা মাছের বিষক্রিয়ায় মানুষ মারা যায়—এ-খবরটি জাতীয়ভাবে প্রচার করতে পারলে ভবিষ্যৎ প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় তা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। নরসিংদীতে প্রথম প্রাদুর্ভাবের ঠিক পরেই বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় টেলিভিশন এবং খবরের কাগজের মাধ্যমে পটকা মাছের উৎস, এর বিষক্রিয়া এবং সমুদ্র ও নদীর পটকা মাছের আকার-আকৃতির ওপর ব্যাপক প্রচারাভিযান চালায়। এতে মানুষকে যেকোনো পটকা মাছ খাওয়া থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করা হয়। তবে, যারা পরবর্তীতে প্রাদুর্ভাবের কবলে পড়ে তারা এসব খবর জানতো না বলে জানিয়েছে।

পটকা মাছ খাওয়া থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য ভবিষ্যতে আরো সহজবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য করে সতর্কবার্তা তৈরি করা উচিত। গ্রামের মধ্যে সাইকেল, রিক্সা অথবা ভ্যান গাড়িতে করে মাইকে, গণসংগীতের মাধ্যমে, চায়ের স্টলে অথবা স্কুল এবং মসজিদের সীমানা-দেওয়ালে পোস্টার লাগানোর মাধ্যমে, এবং স্থানীয় হাটের দিনে লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে সংবাদ বা সতর্কবার্তা প্রচার করা যেতে পারে।

চিকিৎসকদেরও এ-বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। তাঁরা যদি এমন কোনো রোগী দেখেন যাদের শরীরের সর্বত্রই একটি ঝিনঝিন ভাব থাকে, মাথা ঘোরে এবং শরীরের কোনো অংশ বা হাত-পা অবশ হয়ে যায়, তাহলে তারা পটকা মাছ খেয়েছে কি না তা অনুসন্ধান করে দেখা উচিত। টেট্রোডোটক্সিনের বিরুদ্ধে যেহেতু নির্ধারিত কোনো অ্যান্টিডোট নেই, অ্যাট্রোপাইনের সাথে নিওস্টিগমাইনের সঠিক মাত্রার প্রয়োগ এবং সাপোর্টিভ চিকিৎসার মাধ্যমে মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা যেতে পারে। কোনো রোগীকে পটকা মাছের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত বলে সন্দেহ করলে চিকিৎসকগণের উচিত তাড়াতাড়ি তা স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে জানানো।

সবশেষে বলা যায়, বিষাক্ত পটকা মাছ খাওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য ব্যাপক প্রচারাভিযান চালানো প্রয়োজন। যে ব্যক্তি পটকা মাছের বিষক্রিয়া সম্পর্কে জানেন তার উচিত তার পরিচিত সবাইকে তা জানানো। এভাবে সকলের সচেতনতার মধ্য দিয়েই এ-মাছ খাওয়া বন্ধ হতে পারে। ■

গর্ভধারণ ও সন্তানপ্রসব-সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বার্তা

নৌশিন ইসলাম, আইসিডিডিআর,বি

বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার অনেকাংশে কমে এসেছে। ২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী, প্রতি ১০০,০০০ প্রসূতির মধ্যে ১৯৪ জন মারা যায়। ২০০১ সালে এই সংখ্যা ছিলো ৩২০। যদিও সার্বিকভাবে বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে, এই হার এখনো অনেক বেশি এবং অনেক মা গর্ভকালীন ও প্রসব-পরবর্তী দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতায় ভোগেন। ২০১০ সালের বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু ও স্বাস্থ্যসেবা জরিপে দেখা গেছে যে, ৬৮.৪% গর্ভবতী নারী গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা বা antenatal care (ANC) গ্রহণ করেন নি, কেননা তারা এসময়ে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। আমাদের দেশের মানুষের ধারণা, গর্ভধারণ ও প্রসবের বিষয়টি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং এর জন্য বিশেষ কিছুর প্রয়োজন নেই। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে যে, আমাদের দেশে গর্ভধারণ ও প্রসবজনিত মৃত্যুর সাথে সরাসরি যে কারণগুলো সম্পৃক্ত সেগুলো হলো অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ (৩১%), একলাম্পশিয়া বা খিঁচুনি (২১%), বাধাগ্রস্ত ও প্রলম্বিত প্রসব (৭%), গর্ভপাত (১%), এবং অন্যান্য (৪০%)। অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে হৃদরোগ, আত্মহত্যা, নির্যাতন, ইত্যাদি। মাতৃমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্যসেবা নেওয়ার বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের প্রচারণার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

গর্ভধারণের বিষয়টিকে অনেকেই খুব সাধারণ একটি ব্যাপার বলে মনে করেন। কিন্তু বাস্তবে গর্ভে সন্তান ধারণ করা, প্রসব করা এবং প্রসব-পরবর্তী প্রক্রিয়াগুলো বেশ জটিল। গর্ভবতী নারী এবং তার গর্ভের সন্তান কী পরিমাণ ঝুঁকির মধ্যে থাকে তা প্রায়ই জানা যায় না কারণ অনেক প্রসূতি প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে সমর্থ হন না।

অজ্ঞতা, সংসারের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, চিকিৎসা-সংক্রান্ত সঠিক তথ্যের অভাব, সামাজিক নিয়মকানুন বা বিধি-নিষেধ এবং কুসংস্কারের মতো বিষয়গুলো গর্ভকালীন সময়ে এবং প্রসব বা প্রসব-পরবর্তী সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে বড় ধরনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে ৭২% মহিলা গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের জন্য কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান না কারণ তারা মনে করেন যে, এসময়ে কোনো ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই। অন্যান্য বেশকিছু গবেষণায় দেখা গেছে, গর্ভবতী অবস্থায় বা প্রসব-পরবর্তী সময়ে মহিলাদের কোনো অসুবিধা হলে বা কোনোরকম জটিলতা দেখা দিলে পরিবার ও সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ একে 'উপরি বাতাস' বা 'আলগা দোষ' হিসেবে মনে করে।

গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসব-পরবর্তী সময়ে একজন মা ও তার পরিবারের সদস্যদের কী কী করণীয় সে-বিষয়ে মানুষকে জানানোর উদ্দেশ্যে সরকারি ও বেসরকারি অনেক স্বাস্থ্যপ্রকল্প কাজ করে চলেছে। এসব প্রকল্পে বিভিন্ন ধরনের প্রচার-মাধ্যমের সাহায্যে মা, নবজাতক ও শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। এই মাধ্যমগুলো হলো উঠান বৈঠক, দলীয় আলোচনা, স্টিকার, লিফলেট, পোস্টার, বিলবোর্ড এবং নাটক ও জারিগান যা টেলিভিশন ও রেডিওতে নিয়মিত প্রচার করা হয়। এসব প্রচারণার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মাঠকর্মীরা অবিরাম কাজ করে চলেছেন।

প্রসব ও প্রসব-পরবর্তী ৫টি বিপদচিহ্ন

গর্ভবতী মায়ের মধ্যে নিচের যেকোনো একটি বা একাধিক লক্ষণ দেখা দিলে তাকে সাথেসাথে নিকটবর্তী হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিতে হবে:

১. গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব (রক্তভাঙ্গা) বা প্রসবের সময় বা তার পরপরই স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি রক্তস্রাব এবং গর্ভফুল না-পড়া;

২. গর্ভকালীন, প্রসবকালীন বা প্রসব-পরবর্তী সময়ে খিঁচুনি হওয়া;

৩. বারো ঘণ্টার বেশি সময় ধরে সত্যিকারের প্রসবব্যথা বিদ্যমান থাকা এবং প্রসবের সময় শিশুর মাথা না-এসে হাত বা পা নিচের দিকে আসা;

৪. পায়ে পানি-আসা (পা ফুলে-ওঠা এবং আঙুল দিয়ে টিপলে ঐ জায়গা কিছুক্ষণ দেবে-থাকা) এবং তার সাথে খুব বেশি মাথাব্যথা হওয়া ও চোখে ঝাপসা-দেখা;

৫. গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের পর খুব বেশি জ্বর-আসা এবং সাথে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব-হওয়া।

এছাড়াও, কোনো মহিলা গর্ভবতী হওয়ার পর থেকেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। গর্ভবতী মায়ের এসব জরুরী অবস্থা 'ঝুঁকিপূর্ণ মাতৃত্ব' হিসেবে বিবেচিত। নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর মাধ্যমে বোঝা যাবে কোন ধরনের মা বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন এবং কখন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ এবং হাসপাতালে সন্তান প্রসব করানো অত্যন্ত জরুরী।

ঝুঁকিপূর্ণ মাতৃত্ব

১. মায়ের বয়স ১৫ বছরের কম অথবা ৪০ বছরের বেশি হলে;

২. গর্ভধারণের সংখ্যা ৫ম বা তার বেশি হলে;

৩. মারাত্মক রক্তস্বল্পতা থাকলে (শরীরে পর্যাপ্ত রক্তের উপাদান না-থাকলে);

৪. মায়ের সিজারিয়ান-এর ইতিহাস থাকলে;

৫. গর্ভে জমজ অথবা তার অধিক শিশু থাকলে;

৬. মায়ের হাঁপানি অথবা জন্ডিস থাকলে;

৭. গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব হলে;

৮. মায়ের উচ্চরক্তচাপ থাকলে, হাতে-পায়ে পানি আসলে, চোখে ঝাঁপসা দেখলে বা প্রচণ্ড মাথা-ব্যথা থাকলে কিছুকিছু ক্ষেত্রে মাতৃত্ব ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু সবসময় তা মারাত্মক নয়। এসব ক্ষেত্রে প্রত্যেক মায়ের কমপক্ষে ৩ বার গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা বা ANC গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

কিছুকিছু ক্ষেত্রে মা ও গর্ভজাত শিশুর অবস্থা জানার জন্য গর্ভধারণের ৮ম-৯ম মাসে অবশ্যই অন্তত একবার হাসপাতালে পূর্ণাঙ্গ ANC নেওয়া জরুরী, যেমন:

১. মায়ের উচ্চতা ১৪০ সে.মি. (৪ ফুট ৬ ইঞ্চি)-এর কম হলে;

২. মায়ের জরায়ু বের হয়ে আসলে;

৩. প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা এক হয়ে গেলে, অর্থাৎ পায়খানার রাস্তা দিয়ে প্রস্রাব বা প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে পায়খানা বের হলে;

৪. মায়ের যক্ষ্মা রোগ থাকলে (তিন সপ্তাহের বেশি খুশখুশে কাশি থাকলে যক্ষ্মার পরীক্ষা করাতে হয়);

৫. মায়ের হৃদরোগের ইতিহাস থাকলে;

৬. মায়ের ডায়াবেটিসের ইতিহাস থাকলে;

৭. মায়ের মৃতশিশু প্রসবের ইতিহাস থাকলে।

কোথায় স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যাবে

গ্রাম পর্যায়ে

- স্যাটেলাইট ক্লিনিক
- মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র

ইউনিয়ন পর্যায়ে

- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
- মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র

উপজেলা পর্যায়ে

- মাতৃ-শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ইউনিট—উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র
- মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
- এনজিও ক্লিনিক

জেলা পর্যায়ে

- মাতৃ-শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ইউনিট—জেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সাথে সংযুক্ত মডেল ক্লিনিক
- মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র

বিভাগীয় পর্যায়ে

- সদর/বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
- পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সাথে সংযুক্ত মডেল ক্লিনিক
- এনজিও ক্লিনিক

অন্যান্য

- সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র
- ব্র্যাক 'মানসী' প্রকল্প (৭টি সিটি কর্পোরেশনে)
- সূর্যের হাসি ক্লিনিক
- মেরিস্টোপস ক্লিনিক
- বিভিন্ন এনজিও ক্লিনিক

ঢাকা শহরে

- আজিমপুর মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
- মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিস অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার

মা ও শিশুস্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে সমাজের প্রতিটি মানুষের সচেতন থাকা অত্যন্ত জরুরী। অনেক ক্ষেত্রেই একজন গর্ভবতী মহিলা শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল থাকেন। এ-অবস্থায় তার পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত এবং সময়মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই গর্ভধারণসংশ্লিষ্ট এসব বিষয় সম্পর্কে পরিবারের সবারই জ্ঞান থাকা উচিত, যাতে সঠিক সময়ে গর্ভবতী নারীর যথাযথ স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিত করা যায়। গর্ভবতী নারীর সঠিক পরিচর্যা মাতৃমৃত্যুর হার কমাতে পারে এবং সামগ্রিকভাবে মা ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়ন সাধনে সহায়তা করতে পারে। ■

বহুল-ব্যবহৃত কিছু রোগনির্ণয় পদ্ধতি সম্পর্কে জানুন

এ এম রাজ্জাক, আইসিডিডিআর,বি

বিভিন্ন রোগ নির্ণয় বা স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আমাদেরকে প্রায়ই ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যেতে হয়। যে পরীক্ষার জন্য আমাদেরকে সেখানে যেতে হয় সে-সম্পর্কে কিছু জ্ঞান থাকলে আমরা তা তুলনামূলকভাবে সহজে করাতে পারি। আমরা সচরাচর যেসব পরীক্ষা করিয়ে থাকি তার কয়েকটির নিয়ম-কানুন নিচের ছকে দেওয়া হলো, যা রোগী এবং রোগনির্ণয়কারী মেডিকেল টেকনোলজিস্ট উভয়েরই জানা থাকা ভালো।

পরীক্ষার নাম	কখন এই পরীক্ষার প্রয়োজন হয়	সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরীক্ষা (উল্লেখিত পরীক্ষার সাথে বা পরবর্তী পর্যায়ে এর প্রয়োজন হতে পারে)	যেসব পরীক্ষা করা হয়	পরীক্ষার জন্য পূর্ব-প্রস্তুতি/কী অবস্থায় এই পরীক্ষা করা হয়	প্রয়োজনীয় রক্তের পরিমাণ	টেস্ট টিউবের ধরন
Blood culture (FAN-First antibiotic neutralizer)	রক্তে রোগজীবাণুর উপস্থিতি ও ধরন নির্ণয় করতে	CBC; Peripheral blood film; Triple antigen	Sensitivity for antibiotic	এই পরীক্ষায় অত্যন্ত সাবধানতার সাথে জীবাণুমুক্ত উপকরণের সাহায্যে রক্ত সংগ্রহ করতে হয়	প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে ৫ মিলি এবং শিশুদের ক্ষেত্রে ৩ মিলি রক্ত প্রয়োজন	
Anti-dengue virus or Dengue IgG & IgM or ICT dengue or Dengue spot test	ডেঙ্গু জ্বর নির্ণয় করতে	Platelet count; Hct; SGPT	Dengue IgG & IgM	৫ দিনের বেশি জ্বর থাকলে এই পরীক্ষা করাতে হয়	৪ মিলি রক্ত প্রয়োজন	
CBC (Complete blood count)/ Hemogram or Blood R/E or CP (Complete picture) or FBC (Full blood count)	স্বাস্থ্যের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে; রক্তস্বল্পতা নির্ণয় করতে	Blood C/S	Hb%; TWBC; TRBC; HCT; ESR; Absolute values; TCE; Platelet count; Diff. count of WBC; Red cell indices	৫ দিনের বেশি জ্বর থাকলে এই পরীক্ষা করাতে হয়	২ মিলি রক্ত প্রয়োজন	
Lipid profile	হৃদযন্ত্রের ঝুঁকি ও হৃদরোগ চিহ্নিত করতে; উচ্চরক্তচাপের কারণ নির্ণয় করতে; স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে জানতে	CPK; CPK-MB; Troponin-I; Myoglobin CRP; AST; LDH	Cholesterol ; Triglycerides; HDL (good cholesterol); LDL (bad cholesterol); Ratio HDL/ LDL; Ratio Cho/Tri	পরীক্ষার জন্য রক্ত দেওয়ার আগের রাত থেকে ১২ ঘণ্টা না-খেয়ে থাকতে হয়	৪ মিলি রক্ত প্রয়োজন	
eGFR (Estimated glomerular filtration rate)	কিডনির কার্যকারিতার শতকরা হার পরিমাপ করতে	Urine R/E; CCR; ACR	Creatinine; G.F. rate %; Height and weight	যেকোনো সময় রক্ত দেওয়া যায়, তবে অভুক্ত অবস্থায় পরীক্ষা করানো ভালো; বয়স, লিঙ্গ, উচ্চতা এবং ওজন দেখতে হয়	৪ মিলি রক্ত প্রয়োজন	
Triple antigen or Febrile antigen	টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, ব্রুসেলা এবং প্রটিয়াস জ্বর নির্ণয় করতে	CBC; Film; Blood C/S	Widal; Brucella; Weil-Felix	৫ দিনের বেশি জ্বর থাকলে এই পরীক্ষা করাতে হয়	৪ মিলি রক্ত প্রয়োজন	

পরীক্ষার নাম	কখন এই পরীক্ষার প্রয়োজন হয়	সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরীক্ষা (উল্লেখিত পরীক্ষার সাথে বা পরবর্তী পর্যায়ে এর প্রয়োজন হতে পারে)	যেসব পরীক্ষা করা হয়	পরীক্ষার জন্য পূর্ব-প্রস্তুতি/কী অবস্থায় এই পরীক্ষা করা হয়	প্রয়োজনীয় রক্তের পরিমাণ	টেস্ট টিউবের ধরন
OGTT (Oral glucose tolerance test)	ডায়াবেটিস নির্ণয় করতে; ইনসুলিন-নামক হরমোনের অবস্থা যাচাই করতে; দেহে শর্করার বিপাক ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে	HbA1C	Fasting glucose and corresponding urine; 1 HA 75g glucose and corresponding urine; 2 HA 75g glucose and corresponding urine	পরীক্ষার জন্য রক্ত দেওয়ার আগের রাত থেকে ১০ ঘণ্টা না-খেয়ে থাকতে হবে। শিরা থেকে রক্ত সংগ্রহ করতে হয়	খাওয়ার আগে ২ মিলি এবং গ্লুকোজ খাওয়ার পর ১ ঘণ্টা ও ২ ঘণ্টা পর ২ মিলি করে রক্ত প্রয়োজন এবং প্রতিবার ১৫ মিলি প্রস্রাব সংগ্রহ করতে হয়	Na_2EDTA Fluoride
HbA1C (Glycosylated hemoglobin)	দেহে শর্করার বিপাক ক্রিয়া এবং বিভিন্ন সময়ে ডায়াবেটিসের মাত্রা পর্যবেক্ষণ করতে	OGTT	HbA1C%	এই পরীক্ষার জন্য বিশেষ কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই	২ মিলি রক্ত প্রয়োজন	
CMP (Comprehensive metabolic panel)	রোগীর স্বাস্থ্যের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে; উচ্চরক্তচাপের কারণ নির্ণয় করতে; দেহে পটাসিয়ামের পরিমাণ নির্ণয় করতে	BMP (Basic metabolic panel)	Glucose F; Electrolytes; A/G Ratio; LFT; Urea/ BUN; Creati-nine; Calcium; Lipid profile; Uric acid; TSH, FT4; HbA1C; CBC; Urine R/E	পরীক্ষার জন্য রক্ত দেওয়ার আগের রাত থেকে ১২ ঘণ্টা না-খেয়ে থাকতে হয়	এই পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত ৫টি টেস্ট টিউবে প্রয়োজনীয় রক্তের পরিমাণ লেখা থাকে	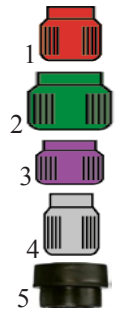 1 2 3 4 5

গর্ভাবস্থায় আরএইচ অসামঞ্জস্যতার ফলে সৃষ্ট সমস্যা ও প্রতিকার

রাবেয়া রহমান, আইসিডিডিআর,বি

মা হওয়ার মাধ্যমে একজন নারীর জীবনে পূর্ণতা আসে। অনাগত শিশুকে ঘিরে মা-বাবা থেকে শুরু করে পরিবারের সবাই স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করেন। সবাই শিশুর ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা পরিকল্পনা করতে শুরু করেন। কিন্তু সামান্য অসচেতনতার ফলে এই স্বপ্নের ইতি ঘটতে পারে। জ্ঞানের একটু স্বল্পতার কারণে বিরাট সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।

আমাদের রক্তের গ্রুপের ধরন বুঝাতে রেসাস (Rhesus) শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যার সংক্ষেপিত রূপ আরএইচ (Rh)। গর্ভবতী মা ও শিশুর রক্তের আরএইচ অসামঞ্জস্যতার ফলে বা অন্য কোনো কারণে মায়ের শরীরে আরএইচ অ্যান্টিবডি তৈরি হলে পরবর্তী গর্ভাবস্থায় গর্ভস্থ শিশুর বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে, যা কখনো কখনো শিশুর মৃত্যুর কারণও হয়ে উঠতে পারে।

গর্ভাবস্থায় আরএইচ অসামঞ্জস্যতা

কোনো কারণে একজন আরএইচ-নেগেটিভ মহিলার শরীরে ভুলক্রমে আরএইচ-পজিটিভ রক্ত দেওয়া হলে বা তিনি গর্ভে আরএইচ-পজিটিভ শিশু ধারণ করলে তার শরীরে আরএইচ অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। এক্ষেত্রে পরবর্তীকালে যদি তিনি আবার আরএইচ-পজিটিভ শিশু গর্ভে ধারণ করেন তবে আরএইচ অসামঞ্জস্যতার সৃষ্টি হয়। আরএইচ অসামঞ্জস্যতা গর্ভস্থ শিশুকে মারাত্মক কিছু স্বাস্থ্যসমস্যার দিকে ঠেলে দিতে পারে। আরএইচ-নেগেটিভ মায়ের গর্ভের শিশু আরএইচ-পজিটিভ হলে এবং শিশুর রক্তের সামান্য পরিমাণ অংশও placenta বা গর্ভফুল অতিক্রম করে মায়ের রক্তে মিশে গেলে মায়ের শরীর আরএইচ অ্যান্টিবডি তৈরি করতে শুরু করে। এর ফলে পরবর্তীতে সেই মা আবার গর্ভবতী হলে এবং গর্ভের শিশুটি তার বাবার আরএইচ অ্যান্টিজেন পেয়ে আরএইচ-পজিটিভ হলে মা ও শিশুর মধ্যে আরএইচ অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়। উল্লেখ্য, কেবলমাত্র আরএইচ-নেগেটিভ মহিলাদের মধ্যেই আরএইচ অসামঞ্জস্যতার সৃষ্টি হতে পারে—আরএইচ-পজিটিভ মহিলাদের ক্ষেত্রে এমন ঘটে না।

রক্তের গ্রুপ কী

প্রত্যেক ব্যক্তির রক্তের লোহিত কণিকার কোষ-পর্দায় কিছু অ্যান্টিজেন বা প্রোটিন থাকে, যা ওই ব্যক্তির গ্রুপ নির্ধারণ করে। রক্তের গ্রুপগুলো হলো ‘A’, ‘B’, ‘AB’ এবং ‘O’। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তির লোহিত কোষ-পর্দায় ‘A’ অ্যান্টিজেন থাকবে তার রক্তের গ্রুপ হবে ‘A’। এভাবেই ‘B’ ও ‘AB’ গ্রুপও নির্ধারিত হবে। যার রক্তের কোষ-পর্দায় ‘A’ বা ‘B’ কোনোটাই থাকবে না তার রক্তের গ্রুপ হবে ‘O’।

‘ABO’ গ্রুপ ছাড়াও রক্তের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আরএইচ ফ্যাক্টর। রক্তে ‘ABO’ প্রোটিন ছাড়াও আরো একধরনের প্রোটিন থাকে। এই প্রোটিনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি-সংক্রান্ত অবস্থাকে আরএইচ ফ্যাক্টর বলা হয়। যার শরীরে এটি উপস্থিত থাকবে তিনি হবেন আরএইচ-পজিটিভ এবং যার শরীরে এটি থাকবে না তিনি হবেন আরএইচ-নেগেটিভ।

গর্ভধারণের ক্ষেত্রে রক্ত সম্পর্কে কী কী জানা জরুরী

১. গর্ভবতী মায়ের নিজের রক্তের গ্রুপ;
২. তার রক্তে হিমোগ্লোবিনের হার;
৩. স্বামীর রক্তের গ্রুপ।

কীভাবে আরএইচ অ্যান্টিবডি তৈরি হয়

আরএইচ অ্যান্টিবডি তৈরি হওয়ার কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. আরএইচ-নেগেটিভ মহিলার শরীরে ভুলক্রমে আরএইচ-পজিটিভ রক্ত দেওয়া হলে আরএইচ অ্যান্টিবডি তৈরি হতে পারে।
২. আরএইচ-নেগেটিভ মহিলার স্বামী যদি আরএইচ-পজিটিভ হন এবং সেক্ষেত্রে গর্ভের শিশুটি যদি তার বাবার বৈশিষ্ট্য পেয়ে আরএইচ-পজিটিভ হয় তবে মায়ের শরীরে আরএইচ অ্যান্টিবডি তৈরি হতে পারে।
৩. গর্ভের ভ্রূণ আরএইচ-পজিটিভ হলে গর্ভপাতের সময় রক্তক্ষরণের ফলে মায়ের শরীরে আরএইচ অ্যান্টিবডি তৈরি হতে পারে।

আরএইচ অসামঞ্জস্যতা কীভাবে ক্ষতি করে

মায়ের শরীরে সৃষ্ট আরএইচ অ্যান্টিবডি আরএইচ-পজিটিভ শিশুর রক্তের লোহিত কণিকাগুলোকে ভেঙে দেয়। এতে গর্ভের শিশুটির বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে, যেমন:

- রক্তশূন্যতা;
- তীব্র মাত্রার জন্ডিস;
- মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি (kernicterus);
- Hydrops fetalis হওয়ার কারণে মাতৃগর্ভে মৃত্যু।

আরএইচ অসামঞ্জস্যতা প্রতিরোধে করণীয়

অতীতে আরএইচ অসামঞ্জস্যতা খুবই ভয়ঙ্কর একটি সমস্যা বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে এ-সমস্যার সহজ সমাধান বের হয়েছে। আরএইচ অসামঞ্জস্যতার শিকার হতে পারেন এমন গর্ভবতী মাকে চিকিৎসকগণ আরএইচ ইম্যুনোগ্লোবিউলিন ইনজেকশন দিয়ে থাকেন। এটি টিকার মতো কাজ করে আরএইচ-নেগেটিভ মায়ের শরীরে আরএইচ অ্যান্টিবডি তৈরি হওয়া রোধ করে। সাধারণত দুই ডোজ আরএইচ ইম্যুনোগ্লোবিউলিন ইনজেকশন দেওয়া হয়ে থাকে। প্রথমবার গর্ভাবস্থায় গর্ভের শিশুটি আরএইচ-পজিটিভ হলে আরএইচ ইম্যুনোগ্লোবিউলিন-এর প্রথম ডোজটি গর্ভধারণের ২৮ সপ্তাহে দিতে হয় এবং পরবর্তী ডোজটি সন্তান প্রসবের পর ৭২ ঘণ্টার মধ্যে দিতে হয়।

কিছুকিছু ক্ষেত্রে একটি ডোজের মাধ্যমে আরএইচ ইম্যুনোগ্লোবিউলিন ইনজেকশন দেওয়া হয়, যেমন:

- গর্ভপাত হলে;
- অ্যামনিওসেন্টেসিস পরীক্ষা করাতে গিয়ে মায়ের শরীরে আরএইচ-পজিটিভ রক্ত প্রবেশ করতে পারে এমন আশঙ্কা থাকলে;
- গর্ভকালীন সময়ে যেকোনো কারণে রক্তপাত হলে।

হাইড্রপস ফেটালিস-এ আক্রান্ত একটি শিশুর মরদেহ

আরএইচ অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে গেলে করণীয়

১. চিকিৎসক যদি বুঝতে পারেন যে, গর্ভবতী মায়ের শরীরে আরএইচ অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে:
   - গর্ভবতী মাকে বিশেষ পর্যবেক্ষণের আওতায় রাখতে হবে। নির্দিষ্ট সময় পরপর অ্যান্টিবডি টাইটার পরীক্ষা করে অ্যান্টিবডির মাত্রা দেখতে হবে।
   - অ্যামনিওসেন্টেসিস করে গর্ভের শিশুর রক্তশূন্যতা হয়েছে কি না তাও দেখা দরকার।
   - প্রয়োজনবোধে সিজারিয়ান সেকশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
২. প্রসবের পর নবজাতকের শরীরে আরএইচ অসামঞ্জস্যতা দেখা দিলে একটি বিশেষ রক্তদান পদ্ধতির সাহায্যে exchange transfusion-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

একজন আরএইচ-নেগেটিভ গর্ভবতী মায়ের করণীয়

একজন আরএইচ নেগেটিভ মহিলা যখন গর্ভবতী হন, সুস্থ সন্তান জন্মদানের জন্য তাকে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, যেমন:

১. স্বামীর রক্তের গ্রুপ দেখে জেনে নিতে হবে স্বামী আরএইচ-পজিটিভ কি না।
২. গর্ভপাত হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করে আরএইচ ইম্যুনোগ্লোবিউলিন ইনজেকশন নিতে হবে।
৩. কোনো কারণে রক্তের প্রয়োজন হলে রক্ত গ্রহণের আগে দাতার রক্ত আরএইচ-নেগেটিভ কি না সে-সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হবে।
৪. গর্ভকালীন সময়ে গর্ভের শিশুটি আরএইচ-পজিটিভ হলে নির্দিষ্ট সময় পরপর আরএইচ অ্যান্টিবডি টাইটার করে দেখতে হবে এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আরএইচ অসামঞ্জস্যতার ফলাফল অত্যন্ত ভয়াবহ হলেও এর প্রতিরোধ-ব্যবস্থা বেশ সহজ। সময়মতো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা গেলে এই সমস্যাকে জয় করা সম্ভব। কিন্তু সেজন্য আরএইচ অসামঞ্জস্যতা সম্পর্কে চিকিৎসক থেকে শুরু করে আরএইচ-নেগেটিভ সন্তানসম্ভবা মা ও তার অভিভাবকদের জ্ঞান ও সচেতনতা খুবই জরুরী। আমাদের দেশে এসব বিষয়ে সচেতনতার বেশ অভাব। ফলে অসুস্থ শিশু বা মৃতশিশু প্রসবের মতো ঘটনা ঘটলেও তার পেছনের কারণগুলো সবার অজানাই থেকে যায়। এসব বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশুর জন্ম নিশ্চিত করা আমাদের সবার দায়িত্ব। একটি সুস্থ শিশু জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। ■

জন্মপূর্ব রোগনির্ণয় বা প্রিন্যাটাল ডায়াগনোসিস

এম করিম খান
কমিউনিটি বেইজড মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ

কোনো শিশু জন্ম নেওয়ার সময় আমরা সবাই চাই পুরোপুরি সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক একটি শিশু। যেকোনো কারণে এর ব্যতিক্রম ঘটলে মা-বাবাসহ পরিবারের সবাই খুব হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অনাকাঙ্ক্ষিত এই হতাশার হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে জন্মের আগেই রোগনির্ণয়ের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যদিও আমাদের দেশে এখনও এ-ব্যবস্থা তেমন বিকাশ লাভ করে নি। এমন অনেক রোগ আছে, যা গর্ভকালীন অবস্থায় নির্ণয় করা যায় এবং সময়মত সেগুলোর কিছুকিছু প্রতিকারও করা যায়। সাধারণত আমরা গর্ভাবস্থায় যে রোগগুলো নির্ণয় করতে পারি সেগুলো হচ্ছে থ্যালাসেমিয়া, সিকল-সেল অ্যানেমিয়া (রক্তাল্পতা), ডাউনস সিনড্রোম, সিসটিক ফাইব্রোসিস, হেমোফিলিয়া জেনেটিক ডিজিজ, নিউরাল টিউব ডিফেক্ট, স্পাইনা বাইফিডা, তালু-কাটা এবং অন্যান্য জন্মগত ত্রুটি।

জন্মপূর্ব রোগ সনাক্ত করার জন্য গর্ভবতী মায়ের যেসব পরীক্ষা করা হয়ে থাকে সেগুলো হলো:

১. আল্ট্রাসনোগ্রাফি;

২. অ্যামনিওসেন্টেসিস;

৩. করিওনিক ভিলাস স্যামপ্লিং;

৪. সিরাম আলফা-ফিটোপ্রোটিন;

৫. সিরাম বিটা হিউম্যান করিওনিক গোনাডোট্রপিন (HCG);

৬. সিরাম ইস্ট্রিওল।

আমাদের দেশে জন্মপূর্ব রোগনির্ণয়ের ক্ষেত্রে আল্ট্রাসনোগ্রাফি বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটি একটি সহজ ও সুলভ নন-ইনভেসিভ প্রক্রিয়া। একজন দক্ষ সনোলজিস্ট গর্ভস্থ শিশুর কোনো জন্মগত ত্রুটি আছে কি না তা আগে থেকেই বলে দিতে পারেন। জন্মগত ত্রুটি মারাত্মক হলে সেক্ষেত্রে থেরাপিউটিক অ্যাবরশন বা গর্ভপাত করানো যেতে পারে।

গর্ভধারণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেকোনো সময়ে আল্ট্রাসনোগ্রাফি করা যায় এবং প্রয়োজনে বারবার করা যেতে পারে। আল্ট্রাসনোগ্রাফি-র সাহায্যে করিওনিক ভিলাস স্যামপ্লিং করা হয় এবং তা গর্ভধারণের ৮-১২ সপ্তাহের মধ্যে করা যায়। এটি আমাদের দেশে এখনও তেমন প্রচলিত নয়। অ্যামনিওসেন্টেসিস গর্ভধারণের ১২ সপ্তাহ পর করা হয়। করিওনিক ভিলাস স্যামপ্লিং এবং অ্যামনিওসেন্টেসিস করতে তেমন কোনো জটিলতা হয় না। দক্ষ হাতে করা হলে এর সামগ্রিক ঝুঁকি মাত্র ১%।

মায়ের সিরাম আলফা-ফিটোপ্রোটিন বেড়ে গেলে অনুমান করা যায় যে, শিশুর নিউরাল টিউব ডিফেক্ট রয়েছে। আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে তা নিশ্চিত করা যায়। মায়ের সিরাম HCG লেভেল খুব বেশি হলে মোলার প্রেগন্যান্সির আশঙ্কা করা হয়। আবার গর্ভধারণের শেষের দিকে হঠাৎ করে মায়ের সিরাম HCG লেভেল কমে গেলে বুঝতে হবে বাচ্চা ভালো নেই। সেক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি ডেলিভারি করাতে হবে।

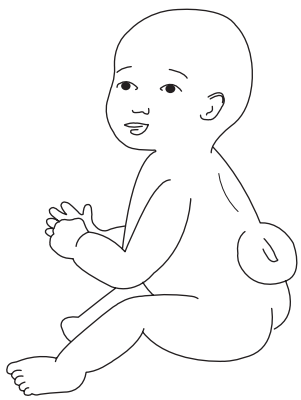

গর্ভে থাকা অবস্থায় শিশুর মেরুদণ্ডের পরিপূর্ণ বিকাশ না-ঘটার ফলে স্পাইনা বাইফিডা দেখা দেয়। এ-অবস্থায় শিশুর নিউরাল টিউবের কিছু অংশ উন্মুক্ত থেকে যায় এবং শরীরের বাইরে বেরিয়ে থাকে।

সাধারণত তিনটি উদ্দেশ্যে জন্মপূর্ব রোগনির্ণয় করা হয়ে থাকে:

ক. যেন সঠিক সময়ে ত্রুটিযুক্ত শিশুর সঠিক চিকিৎসা করানো যায়।

খ. যদি কোনো অনিরাময়যোগ্য ত্রুটি থাকে তবে মা-বাবা যেন আগেভাগেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন বাচ্চা রাখবেন কি রাখবেন না—অর্থাৎ ইচ্ছা করলে থেরাপিউটিক অ্যাবরশন করাতে পারেন।

গ. ত্রুটিযুক্ত শিশু জন্ম নিচ্ছে জানলে মা-বাবা যেন শিশুর লালন-পালন ও চিকিৎসার জন্য মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রস্তুতি নিতে পারেন।

ধরা যাক, পরিবারে একটি শিশুর থ্যালাসেমিয়া রোগ আছে। মা আবার গর্ভধারণ করেছেন এবং তিনি খুবই চিন্তিত তার এই অনাগত সন্তানও থ্যালাসেমিয়াতে আক্রান্ত হবে কি না। মা ও বাবা দু'জনই এ-রোগের বাহক হলে (যা হিমোগ্লোবিন ইলেক্ট্রোফোরেসিস পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া যায়) ২৫% ক্ষেত্রে শিশু সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে জন্ম নেবে, ৫০% ক্ষেত্রে বাহক হিসেবে জন্ম নেবে এবং ২৫% ক্ষেত্রে রোগ নিয়ে জন্ম নেবে। এক্ষেত্রে গর্ভধারণের ৮-১২ সপ্তাহের মধ্যে করিওনিক ভিলাস স্যামপ্লিং পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া যায় অনাগত শিশুটি রোগ নিয়ে জন্মাচ্ছে না কি বাহক হিসেবে জন্মাচ্ছে। যদি বাহক হিসেবে জন্ম নেয় তবে ভয়ের কিছু নেই। যদি পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া যায় যে শিশুটি রোগ নিয়ে জন্মাবে তবে মা-বাবা ইচ্ছে করলে অ্যাবরশন করাতে পারেন। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে বিবাহপূর্ব রক্ত পরীক্ষা করে জেনে নেওয়া পাত্র-পাত্রী উভয়েই রোগের বাহক কি না। দু'জনই বাহক হলে বিয়ে নাও করতে পারেন আর বিয়ে করলেও বাচ্চা না-নেওয়াই ভালো।

জন্মপূর্ব রোগনির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা এখনও পিছিয়ে আছি। করিওনিক ভিলাস স্যামপ্লিং ও অ্যামনিওসেন্টেসিস আমাদের দেশে হয় না। পার্শ্ববর্তী দেশে জন্মপূর্ব রোগ সনাক্তকরণের সব পরীক্ষাই করা যায়। আমাদের কোনো কোনো ডায়াগনস্টিক সেন্টার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য বিদেশে পাঠায় । রিপোর্ট পেতে ৪-৬ সপ্তাহ সময় লেগে যায় এবং সেক্ষেত্রে গর্ভস্থ বাচ্চা বড় হয়ে যায়। সেসময়ে হয়তো আর থেরাপিউটিক অ্যাবরশন করানোর সুযোগ থাকে না। তাই এসব সমস্যা কাটিয়ে উঠতে আমাদের দেশেই এগুলো চালু করা প্রয়োজন। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে এসব পরীক্ষা চালু করা হলে শিশুর জন্ম-সংক্রান্ত অনাকাঙ্ক্ষিত অনেক সমস্যা এড়ানো সম্ভব হতে পারে। ■

স্বাস্থ্য সংলাপে লেখা আহ্বান
যেকেউ স্বাস্থ্য সংলাপে লেখা দিতে পারেন। স্বাস্থ্যসম্পর্কিত যেকোনো মানসম্মত লেখা আমরা স্বাস্থ্য সংলাপে ছাপাতে পারি। লেখা সম্পর্কে ধারণা নিতে http://www.icddrb.org/shasthyasanglap লিংকটিতে স্বাস্থ্য সংলাপের পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলো দেখুন। লেখা পাঠাবার ঠিকানা: hasib@icddrb.org।